স্ত্রী মৃণালের বুদ্ধি ও রবীন্দ্রনাথ

সাদ কামালী

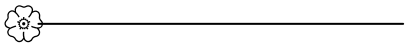

মৃণালকে ঘর থেকে বের করে আনালেও অজানা অচেনা অনিরাপদ কোথাও হারিয়ে ফেলেননি, অথবা মৃণালের গন্তব্য সম্স্লর্কে কোনো সংশয় রাখেননি রবীন্দ্রনাথ। মৃণাল স্বামী সংসারের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন করে গেছে তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে জগদীশ্বরের সমীপে। ... আশ্রিত বিন্দুর বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু পাত্র বিন্দুকে দেখতেও আসে না, বিয়েও হবে রীতিবিরুদ্ধভাবে পাত্রের বাড়িতে। এটা নাকি তাদের কৌলিক প্রথা। মৃণালের মনে পাত্র সম্স্লর্কে কোনো সংশয় না জেগে খরচের কথা মনে আসে, খরচের ভয়েই এরকম প্রথায় সকলে বুঝি সম্মত হয়েছে। বিন্দুর দিদি এবং অন্যসকল আত্মীয় বিন্দুর কান্না আপত্তি কানে তোলে না। মৃণাল শোনে, কিন্তু বুদ্ধিমান মৃণালও একবার প্রশ্ন করে না, কেমন পাত্রের কাছে বিয়ে হ'চ্ছ। বিন্দুর মতো আশ্রিত অসহায় কালো পাত্রীকে না দেখেই যে পাত্র বিয়ে করতে রাজি সেই পাত্রখানা কে ? ... মেয়েদের পক্ষের গল্প বলে পরিচিত 'স্ত্রীর পত্র'-তে দেখা যায় সংসারের কর্তা পুরুষগুলোই গুণে চিন্তায় মানবিক আচরণেও নায়ক। অন্যদিকে, বিন্দুর শাশুড়ি 'যমের মতো' ফাঁকি দিয়ে পাগল ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে। মৃণালের বড়ো জা'র অনেক সঙ্কীর্ণ মনের অনেক খবর গল্পে যত্রতত্র রয়েছে, বিন্দুর বয়স লুকাবার চেষ্টা করেছে। পাগল স্বামীর ঘর থেকে বিন্দু পালিয়ে এলেও তার মনে করুণারও উদ্রেক হয় না, বরং বলে, পাগল হলেও স্বামী তো ! মৃণাল আবিষ্কার করে, 'মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না।' সংসারে মৃণাল মেয়েদের ওপর পুরুষের অত্যাচার, দয়াহীন আচরণ দেখতে পেয়েছে না মেয়েদের নিষ্ঠুরতা দেখেছে বেশি !

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাবা একদিন বলেছিলেন, 'নীরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি বউ ঘরের বার হয়েছে।' বাবার এই কথার সঙ্গে নীরোদ বাবু পরে যোগ করেন, 'তবু তাহাদের সকলেই সতী রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় দেখান নাই, তাহা কি তিনি ব্রাহ্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বলিয়া ?' [নির্বাচিত প্রবন্ধ, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী আনন্দ] স্ত্রীর পত্র গল্পের মৃণাল ঘর থেকে বের হয়েও প্রশ্নাতীত সতী থেকে যায়। মৃণালকে ঘর থেকে বের করে আনালেও অজানা অচেনা অনিরাপদ কোথাও হারিয়ে ফেলেননি, অথবা মৃণালের গন্তব্য সম্স্লর্কে কোনো সংশয় রাখেননি রবীন্দ্রনাথ। মৃণাল স্বামী সংসারের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন করে গেছে তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে জগদীশ্বরের সমীপে। শরৎবাবুর অনেক নায়িকাও বৈধব্য, আরও অনেক সঙ্কটের চাপে গয়া-কাশিতে আশ্রয় করে নিয়েছিল। তবে স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল শুধু রবীন্দ্রনাথের গল্পেই নয় বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। মৃণাল সৃষ্টির প্রায় শত বৎসর পরিক্রমা শেষেও এমন আত্মসচেতন, সংবেদনশীল নারী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে শত শত নেই। সংসারের ভিতর নারীর অপমান, পীড়ন মৃণাল যেমন নিজে অনুভব করেছে তেমন আঙ্গুল দিয়ে অন্যদেরকেও দেখিয়ে দিয়েছে। মৃণালের এই দেখিয়ে দেয়া, আত্মসম্মান, বিবেক বুদ্ধি যতটা স্বাধীন বা স্বতস্ফূর্ত তার চেয়ে বেশি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের এই নিয়ন্ত্রণ বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে বেগ পেতে হয় না। উচ্চবিত্ত রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সুন্দরী মেজবউ মৃণালকে ১৩২১ বাংলা সনে ঘর থেকে বের করে আনা বড়ধরণের চ্যালেঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ সামর্থ্যে তা সফল হয়েছেন। যদিও বিপিনচন্দ্র পাল (মৃণালের কথা, নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২১) সহ হালের আহমদ রফিক (প্রসঙ্গ নারী অধিকার ঃ মেজবৌ মৃণাল কতটা বিদ্রোহী, ইউ পি এল ২০০২) মৃণালের অতি বিদ্রোহ অথবা বিদ্রোহের ঘাটতি নিয়ে তর্ক করে আসছে। বিপিনচন্দ্র পালের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পড়েছেন, মন্তব্য করেছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ১৭ মে ১৯৪১ , রাণী চন্দকে বলেছেন,

> ‘প্রথমে আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর পত্র গল্প বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন ? তার পরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।

মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রী মৃণালকে দিয়ে কি বলিয়েছেন তার আগে সদুর কথা জেনে নিই, এবং সুবিধা পেয়ে সদুকে দিয়ে তিনি কি বলালেন! বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্মের আবর্তন বিবর্তনে প্রবাদতুল্য জোড়াসাঁকোর বিত্তবান ঠাকুর পরিবারের শ্রেষ্ঠ ঠাকুরের মেয়েদের পক্ষে বলার ক্ষেত্রে কোন ধরণের অসুবিধা ছিল, আদৌও ছিল কি না তা ভিন্ন এবং অনর্থক এক গবেষণার বিষয়। তার থেকে সহজ ও জরুরি হলো সদুর বদনাম গল্পটি পড়ে নেয়া। বদনামের প্রধান চরিত্র বৃটিশের পুলিশ ইন্সপেক্টারের স্ত্রী সৌদামিনী ওরফে সদু অনেক কথা বলে, বলার জন্যে বলে, গল্পের প্রয়োজনে বলা নয়। সুবিধা পেয়ে সদুকে দিয়ে মেয়েদের পক্ষে বিশেষ কোন কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন ? ইন্সপেক্টার স্বামীর জন্য স্ত্রী সৌদামিনী রাত দুটা তিনটা অবধি খাবার আগলে বসে থাকে এবং বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের দেয়া সুযোগে প্রাসঙ্গিকতার বাইরে অনেক অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলে,

> ‘মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলআনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা – এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে টেনে নিয়ে বেড়াও। ... সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী, বলবে দজ্জাল মেয়ে।’

এই অনর্গল কথার ফাঁকে স্বামী পরম নিশ্চিন্তে বলে, ‘তোমার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার, তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।’ স্বামী বিজয়বাবুর এই উপেক্ষা অবজ্ঞাসুচক মন্তব্যের উত্তরে জমানো অন্ধকার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপের এইমাত্র প্রতিশ্রুতির ঘোষক সৌদামিনী খুশিতে, অহেতু স্বামী গর্বে মাখনের মতো গলে যায়, হ্যা গো ‘... আমি জানি আমি যাই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ মানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। ... আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সবসময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এইজন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।’ সদুর এমন প্রগলভতায় স্বামী আবারও খোঁচা দেয়, ‘সদু আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে।’

ইন্সপেক্টার বিজয়বাবুর কাঁধে দায়িত্ব চেপেছে বিখ্যাত স্বদেশী অনিল অথবা বৃটিশ পুলিশের ভাষায় অনিল ডাকাতকে গ্রেপ্তার করার। এই স্বদেশী অনিল বড় বিচিত্র, বলা ভালো অদ্ভুত। সাধারণ হিন্দুজন তাকে দেবতার অবতার মনে করে পুজা করে। হিন্দু পুলিশ কন্সটেবল কিছুতেই তাকে গ্রেপ্তার করার সাহস দেখিয়ে ধর্ম খোয়াতে পারবে না। ডাকাত বা স্বদেশী হিসেবে তার কর্মকাণ্ডের কোনো খোঁজ এই গল্পে না থাকলেও অবতার বা সাধু পুরুষ হিসেবে তার কীর্তিকর্মের খবর অনেক ছড়ানো রয়েছে। অনিল ‘ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে, এটা নাকি অনেকে স্বচক্ষে দেখেছে।’ গ্রামের লোকের বিশ্বাস, ‘ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই।’ অনিলের পায়ের ছাপের ওপর ‘হিন্দু পাহারাওয়ালারা’ ভক্তি ভরে লুটিয়ে পড়তে চায়। কেউ ওই পায়ের চিহ্নের ওপর মন্দির বানাবার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। এক ভক্ত ডিস্ট্রিক জজের কাছে অনিল শিবসংহিতার ব্যাখ্যা

করে গেছে। তো এহেন অনিলকে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণীয়া নারী সদু গোপনে প্রশ্রয় দেয়, পুলিশের খোঁজখবর জানিয়ে সময় মতো সতর্ক করে রাখে। সদু বা সৌদামিনীর কাছেও অনিল শুধু স্বদেশী নয় পুজ্য প্রতিম, এবং সে আক্ষরিক অর্থেই অনিলকে পুজা করে। বড়কর্তার কড়া নির্দেশে ইন্সপেক্টার বিজয়বাবু বড়ো সঙ্কটাপন্ন হয়ে স্ত্রী সদুর শরণাপন্ন হয়, স্বামীর এই 'শরণাপন্ন' অবস্থায় সদু আহ্লাদিত। 'একদল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর এক দল আছে তারা সত্যকারের পুরুষ, তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো।' সদু অতপর এই 'বড়ো' স্বামীর সঙ্কট উদ্ধারে অনিলকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সদুর দেয়া সময় মতো নির্দিষ্ট মন্দিরের সামনে বিজয় এসে দাঁড়ায়, তার বুক কাঁপছে, মন্দিরের ভিতর থেকে মন্ত্রজপের শব্দ আসছে, 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।' এক সময় বিজয় 'সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা। ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড় হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে।' বিজয় বিস্ময়ে আহত, 'সদু অবশেষে তোমার এই কাজ।' সদু আবারও অনেক কথার ভিড়ে বলছেন :

> 'যাঁর (স্বামীর) কোনো হুকুম কখনো ঠেলতে পারিনি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম – এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে (অনিলকে) আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব।'

এই সদুও সতী সাধ্বী কলঙ্কহীন। ঘর ছেড়ে বের হলেও নিষ্কলঙ্ক, আসামী অনিল তা নিশ্চিত করছে, 'খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে (সদুকে), চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। ... বিশ্বসংসারের লোক সদু সম্বন্ধে কিছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন।' একজন স্বদেশী নেতাকে দেবতার মতো পুজা করে, ঘরকন্নার চাতুরী দেশের কাজে লাগিয়ে এবং স্বামীর প্রতি ভক্তিভরে কর্তব্য পালন করেও সৌদামিনীকে কলঙ্কহীনতার নিশ্চয়তা আদায় করতে হয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে দিয়ে প্রচুর কথা বলিয়ে নিয়েছেন ! আষাঢ় ১৩৪৮ সালে জীবন সায়াহ্নে এই গল্প লেখার আগে স্ত্রীর পত্র লিখবার পর জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫-এ লিখেছিলেন 'সংস্কার' গল্পটি। 'সংস্কার' গল্পের নায়িকা কলিকাও স্বদেশী, স্বামী গিরীন্দ্র তার বিপরীত। সদুর মতো ঘরকন্নার চাতুরী দিয়ে দেশের কল্যাণ কাজে নিয়োজিত হবার মতো নয়। কলিকা চিন্তা ও রাজনৈতিক বোধেই রাজনীতিতে জড়াতে চায়। গিরীন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে কলিকার এই অংশগ্রহণ মেনে নিতে পারে না। তার কাছে মনে হয় 'আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দরপরাটা সেইরকম মালাতিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।' সংস্কার, পুজার মতো বলেই, কোন বুদ্ধি বা চেতনা থেকে কলিকার এই রাজনৈতিক সংশ্রব নয়। কলিকা যখন গিরীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করে উত্তর দেয়, 'দেখো খদ্দর পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে।' তখন স্বামী গিরীন্দ্র কলিকার বুদ্ধি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হয়ে নীরবে বাঁকা হাসে, প্রথম পুরুষে লেখা এই গল্পে অতঃপর পাঠককে জানিয়ে দেয়া হয়, এই বুদ্ধিদীপ্ত কথাটাও কলিকার নয়, মুখস্থ কথা, 'এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আপ্তবাক্য ; তার থেকে কোটেশনমার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।'

বুদ্ধিমান মৃণাল চরিত্র সৃষ্টির পর রক্ষণশীল বিপিনচন্দ্র পালদের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নাকি ভীত নন, তারপরে মেয়েদের দিয়ে তিনি অনেক বলিয়েছেন ! মৃণালোত্তর অনেক বলিয়ে নায়িকাদের খোঁজে সৌদামিনীকে দেখা হয়েছে। সৌদামিনীর আগে কলিকার এই অবস্থা, কলিকার স্বদেশী প্রেম যে শুধুমাত্র সংস্কার, তা প্রমাণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কাজটি করেন তাতে বিপিন পালদেরই খুশি হওয়ার কথা। দেশী বিদেশী উচ্চমার্গের সাহিত্য পড়া স্বামী গিরীন্দ্রের সঙ্গে

বন্ধুর বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিল। পথে ভিড় হাঙ্গামা দেখে গিরীন্দ্র গাড়ি দাঁড় করায়, পাড়ার বুড়া মেথর স্নান শেষ করে পরিষ্কার কাপড় পরে নাতির হাত ধরে যাওয়ার পথে কারও শরীরে তার স্স্পর্শ লেগে থাকতে পারে। এই স্স্পর্শদোষে রাস্তার মানুষ, মারোয়ারি ব্যবসায়ী, বুড়া মেথরটাকে বেদম পেটায়। গিরীন্দ্র এতে আহত হয়ে মেথরকে রক্ষা করতে নিজের গাড়িতে তুলে নিতে চাইলে কলিকা প্রবল আপত্তি জানিয়ে স্বামীর হাত চেপে ধরে, 'করছ কী। ও যে মেথর !' গিরীন্দ্র বলে, 'হোক না মেথর, তাই বলে ওকে অন্যায় মারবে ?' কলিকা বলে, 'ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত ?' তবুও গিরীন্দ্র মেথরকে গাড়িতে তুলতে চাইলে কলিকা বলে, 'তাহলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না।' গল্পের নাম সংস্কার। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল সমর্থক, একজন নারীকে হীন বর্ণসংস্কারে অন্ধ করে দেখালেন কেন রবীন্দ্রনাথ ! স্বদেশী খদ্দর পরাও একটা সংস্কার, আর সংস্কার বলেই কলিকার আগ্রহ, তিনি বোঝাতে চাইলেন – বুদ্ধিহীন, যে পুরুষের বুদ্ধি ধার করে চলে সেই নারীর স্বাদেশিকতাও একরকম সংস্কার ! গিরীন্দ্র এখানে উদার, সংস্কৃতিবান, সংস্কারহীন নায়ক। বৃটিশের পুলিশ ইন্সপেক্টার বিজয়বাবুও মহত নায়ক। অনিলও নায়ক। তবে অনিল স্বদেশী হিসেবে নয় অবতার সদৃশ্য নায়ক, শুধু বিব্রত, আশঙ্কিত সৌদামিনী, অমানবিক সংস্কারে আচ্ছন্ন কলিকা।

স্ত্রীর পত্র প্রকাশ হয় সবুজপত্র শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায়। এর চার বছর পর 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' কবিতাটিও প্রকাশিত হয় ওই সবুজপত্র আষাঢ় ১৩২৫ সংখ্যায়। সদু বা কলিকা নয়, মুক্তি কবিতার নায়িকা ব্যর্থ বাইশ বছর সংসার যাপনের পর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে নিজেকে সংসারের মধ্যে যেভাবে আবিষ্কার করতে পারে তার সঙ্গে পনের বছর সংসার করা মৃণালের পত্র অভিব্যক্তির অনেক মিল উল্লেখ করার মতো। মৃণালের শ্রীক্ষেত্রের পরম গন্তব্যের মতো বাইশ বছরের সংসারে নিগৃহীত মুক্তির নায়িকাও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে কালের পারাবারে অনন্ত শান্তির কামনা ব্যক্ত করে,

'তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু
হেলায় আমায় করবে না সে কভু।

অতঃপর

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি
দাও, খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

লক্ষ্মী, সতী, ভালোমানুষ, কল্যাণীয়া এই মুমূর্ষু বউটির কণ্ঠে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে হলেও বোধ এবং কাব্য সৌন্দর্যে অতুলনীয় চারটি চরণ প্রকাশ করেন। মুক্তির আখ্যান আভাসিত পদ্যের ভিতর এই চরণ চারটি কবিতার উজ্জ্বলতা নিয়ে মহা সত্যের উদ্বোধন ঘটায়, যদিও এই সত্য তার সাহিত্যে কোনো নারীর মধ্যে বা তাঁর গদ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'মুক্তি'র অবিস্মরণীয় চরণ

'আমি নারী, আমি মহীয়সী

আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।'

মৃণাল লিখবার পর আর এক সহজ সরল প্রায় নির্বোধ নায়িকা ষোড়শীকে সৃষ্টি করেছেন 'তপস্বিনী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪) গল্পে। যোগী শিক্ষক পঁচিশ বছরের ষোড়শীকে বলছে, 'এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদুর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে।' যোগী শিক্ষকের মুখ থেকে 'স্ত্রীলোক হয়েও' যোগ সাধনার প্রশংসা শুনে 'ষোড়শীর শরীর-মন পুলকিত হইয়া উঠিল।'

মৃণালোত্তর আরও একটি গল্প 'পাত্র ও পাত্রী' (পৌষ ১৩২৪)-তে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ক্ষমতাধর পুরুষের পাশে সৃষ্টি করেন সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, বোকা নির্বোধ কতগুলি নারী চরিত্র। পাত্র ও পাত্রী গল্পের পাত্র শেষ পর্যন্ত তাদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করতে নারাজ, বলে, 'বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়াছেন।' কলিকা, ষোড়শী বা জীবাণু তুল্য নারী চরিত্র দেখে বিপিনচন্দ্র পাল নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ তাদের স্বস্তি দিতে পেরেছিলেন!

স্বামীর শ্রীচরণকে সদ্বন্ধন করে মৃণাল তার পত্র শুরু করে। আর রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এক অভিনব আঙ্গিকে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি বয়ান করেন। গল্পে বা পত্রে মৃণাল একাধিকবার নিজের বুদ্ধি ও রূপের কথা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সচ্ছল এবং রক্ষণশীল পরিবারের সুন্দরী বুদ্ধিমান মেজো বউ মৃণাল কেন ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো! সংসারের শিকলে নারীর বন্দীদশা, উপেক্ষা, অপমান, অসহায়ত্ব দেখে সংবেদনশীল মৃণাল আত্মসম্মানবোধের মানসিক চাপে ঘর ছাড়ে। প্রত্যক্ষ নির্যাতন নয়, অপমানও নয়, শুধু আত্মসম্মানবোধের তাড়নায় চরণতলাশ্রয়ছিন্ন করে মৃণালের চলে যাওয়ার গল্প পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ পাঠককে সন্দেহমুক্তভাবেই আশ্বস্ত করতে পেরেছেন, মৃণালের সিদ্ধান্তের বাস্তবতা যৌক্তিকতা নিয়ে তত প্রশ্নাকুল নয়। বড়োজা'র ছোট বোন অসহায় বিন্দুর করুণ পরিণতি সংসারে মেয়েদের অবস্থানকে মৃণালের সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলে। আশ্রয়হীন কিশোরী বিন্দুকে মৃণাল আশ্রয় ভালোবাসা দেয়, বিনিময়ে বিন্দুও যারপরনাই ভালোবেসেছে মৃণালকে। আশ্রিত বিন্দুর বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু পাত্র বিন্দুকে দেখতেও আসে না, বিয়েও হবে রীতিবিরুদ্ধভাবে পাত্রের বাড়িতে। এটা নাকি তাদের কৌলিক প্রথা। মৃণালের মনে পাত্র সম্পর্কে কোনো সংশয় না জেগে খরচের কথা মনে আসে, খরচের ভয়েই এরকম প্রথায় সকলে বুঝি সম্মত হয়েছে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, হাতের রান্না থেকে মুখের কথা, দাঁত জিব কণ্ঠনালী যাচাই বাছাই করে যখন একজন পাত্রী ছেলেপক্ষের কাছে উত্তীর্ণ হয় তখন বিন্দুকে দেখতেও আসলো না, না দেখেই পাত্রের সম্মতি! বিন্দু কাঁদে, ভয়ে আতঙ্কে আর্ত হাহাকার করে, সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। বিয়ে করে মৃণালের ভালোবাসার আশ্রয় ছিন্ন করতে সে ভয় পাচ্ছে। বিন্দুর দিদি এবং অন্যসকল আত্মীয় বিন্দুর কান্না আপত্তি কানে তোলে না। মৃণাল শোনে, কিন্তু বুদ্ধিমান মৃণালও একবার প্রশ্ন করে না, কেমন পাত্রের কাছে বিয়ে হচ্ছে। বিন্দুর মতো আশ্রিত অসহায় কালো পাত্রীকে না দেখেই যে পাত্র বিয়ে করতে রাজি সেই পাত্রখানা কে? মৃণাল স্বামীকে বা বিন্দুর দিদিকে বলে না পাত্রের খোঁজ নিতে। বরং বিন্দুই বলে, 'বর যদি ভালো হয় আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে?' বুদ্ধিমান মৃণালসহ পরিবারের সকলেই বিয়ের পর জানলো পাত্র বদ্ধ পাগল। পাগল উন্মাদ ছেলেকে বিয়ে করিয়ে একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করার আয়োজনে আপত্তি জানিয়ে ব্যর্থ পাত্রের বাবা বাড়ি ছেড়ে কাশি চলে গেছে। পাত্রের মা বিন্দুর শাশুড়িকে সে 'যমের মতো ভয় করে।'

স্ত্রীর পত্র গল্পে বুদ্ধিমান মৃণাল একাধিকবার বড়োজা'র কুশ্রী রূপের এবং তার বাবার আর্থিক দৈন্যতার খোঁটা দেয়। মৃণালের নিজের দাবি তার বুদ্ধি স্বাভাবিক সহজাত হলেও এই সংসারের পক্ষে একটু বেশি ; গোপনে মৃণাল কবিতাও লিখত, তবুও তার সংবেদনশীল মন অশিক্ষিত কুশ্রী বড়ো জা যে 'বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা' করত বয়সে বিন্দুকে একটু ছোট দেখানোর জন্য সেই বিষয়েও খোঁচা দিতে আটকালো না ! বিত্তহীন বাবার রূপহীন মেয়ে বড়ো জা'র অসহায়ত্ব অনুমেয়, সংসারের অন্য দশজন সাধারণজনের মতো করে বড়ো নির্দয়ভাবে মৃণালও বলে, 'আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান।' সে তো জানবেই। বুদ্ধিমান মৃণাল মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প করছে। এহেন বড়ো জা সংসারের সাধারণ নিয়মে মৃণালের তুলনায় উপেক্ষিত, তার সম্মানের জায়গা নাই বললেই চলে। যদিও গুণে, কাজে, দায়িত্বপালনে, ব্যবহারে বড়ো জা'র কোনে ত্রুটি নাই, মৃণাল কি বড়ো জা'র পক্ষে এই ইতিবাচকতা স্মরণ করিয়ে দিতে পারত না ! বরং পত্রে মৃণাল বড়ো জা'কে প্রতিপক্ষের মতো বিবেচনা করে প্রায়ই দয়াহীন হয়ে ওঠে।

সংসারের পক্ষে বেশি, সহজাত বুদ্ধির খবর মৃণালের নিজের ঘোষণা ছাড়া আর কোথায় মিলে ! রবীন্দ্রনাথ যতটা অনুগ্রহ করবেন তার বেশি বুদ্ধি মৃণালের থাকবেই কেন ! বিধাতা এবং প্রকৃতির দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বুদ্ধির কোটা নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন, সে খবর মৃণাল জানে না। মৃণাল বুদ্ধি বুদ্ধি বলে যতই গর্ব করুক, আচরণে তার প্রকাশ নাই। বিধাতা এবং প্রকৃতির 'Law of compensation' সম্স্লর্কে রবীন্দ্রনাথ জানতেন, সেই নিয়মে মেয়েরা বুদ্ধিতে খাটো থাকবেই। পুরুষের চেয়ে বেশি তো নয়ই সমকক্ষও হতে পারবে না। 'বিধাতা এমন অন্যায়' কখনো করেননি যে মেয়েরা বুদ্ধিতে সমকক্ষ বা অগ্রবর্তী হতে পারে। তিনি বলেন, 'সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of compensation অর্থাৎ ক্ষতিপুরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলি শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ, ... ।' (রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র নিবন্ধ, পরিশিষ্ট, সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী)। বল শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা বলে শ্রেষ্ঠ নয়, বলে-বুদ্ধিতেও নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় বিজ্ঞানীর মতো জানায়, 'আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি উহবৎমু, তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। ... মেয়েদের একরকম চটপট বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই।'(ঐ) যদি বল শক্তিই শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ামক হয় তবে বল শক্তিতে জলহস্তি রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হাতি ঘোড়া গরু মহিষও শ্রেষ্ঠ !

মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছেন, মৃণালও বড়োজোর চটপটে বুদ্ধির অধিকারী, এজন্য তাকে 'মেয়ে-জ্যাঠা' বলে গালমন্দ শুনতে হতো। বিন্দুর বুদ্ধি তো নাই-ই, রবীন্দ্রনাথের মতো ধর্মবুদ্ধিও নাই। না হলে পাগল স্বামী হলেই কি ঘর ছেড়ে চলে আসতে হবে ? অধীনতা এমনকি পাশব স্বামীর অধীনতাকেও ধর্ম বলে গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অধীনতাকে 'যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তাহলেই আমি বাস্তবিক অধীন ; আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তাহলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্বই বাড়ে।'(ঐ) পাগল স্বামীর অধীন না থেকে বিন্দুর স্ত্রীধর্ম চ্যুত হয়েছে, পরিণতিতে তাকে শাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরতে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মের কথা বিন্দুর শাশুড়ি, দিদি জানে, বলে 'মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত

সংসারে দুর্লভ নয়। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।' বড়ো জা বিন্দুর দিদি বলে 'তা পাগল হোক, ছাগল হোক স্বামী তো বটে।'

মেয়েদের পক্ষের গল্প বলে পরিচিত 'স্ত্রীর পত্র'-তে দেখা যায় সংসারের কর্তা পুরুষগুলোই গুণে চিন্তায় মানবিক আচরণেও নায়ক। শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী, ভাই যদি মানবিকই তবে মৃণালের কষ্ট কোথায় ? শুধু দয়াহীন মেয়েমানুষই সংসারে ভিলেন চরিত্র ! বিন্দুর শ্বশুর পাগল ছেলের এই অমানবিক বিয়ের শেষ পর্যন্ত বিপক্ষে ছিল। মৃণাল সাক্ষ্য দিচ্ছে স্বামী-ভাসুরের তেমন দোষ নেই যে বিধাতাকে দায়ী করবে, 'তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তাহলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনিভাবেই দিন চলে যেত।' এমনকি বিন্দুর যে পাগল স্বামী সেও বিন্দুকে কামড়ে দেয়নি, গালি দেয়নি, বরং ঘোরের ভিতর ভেবেছে 'বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি ; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ।' এবং বিন্দুর স্বামীর এই পাগলামীটুকুই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। বিন্দুর ভাসুরও তেমন মন্দ না, ছোটভাইয়ের বউ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। রাগ হতেই পারত, কিন্তু ভাসুরজী তত মন্দ রাগ দেখায় না। তবে বিন্দু যেতে না চাইলে পুলিশের ভয় দেখিয়েছে মাত্র। অন্য কোনো অপমান নয়। মৃণালের ভাই শরৎ সেও খুব ভালো, প্রগতিবাদী নায়ক – 'যত রকমের ভলাণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা' ইত্যাদি কল্যাণ কর্মে ব্যস্ত।

অন্যদিকে, বিন্দুর শাশুড়ি 'যমের মতো' ফাঁকি দিয়ে পাগল ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে। মৃণালের বড়ো জা'র অনেক সঙ্কীর্ণ মনের অনেক খবর গল্পে যত্রতত্র রয়েছে, বিন্দুর বয়স লুকাবার চেষ্টা করেছে। পাগল স্বামীর ঘর থেকে বিন্দু পালিয়ে এলেও তার মনে করুণারও উদ্রেক হয় না, বরং বলে, পাগল হলেও স্বামী তো ! মৃণাল আবিষ্কার করে, 'মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না।' সংসারে মৃণাল মেয়েদের ওপর পুরুষের অত্যাচার, দয়াহীন আচরণ দেখতে পেয়েছে না মেয়েদের নিষ্ঠুরতা দেখেছে বেশি !

তারপরেও, সংবেদনশীল আত্মসম্মানবোধে সচেতন মৃণাল একদা সংসার ছেড়ে চলেই যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো মৃণাল নামের কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের সত্য ইতিহাস লিখছেন না, লিখছেন আর্টফর্ম-ছোটগল্প। ঘর ছেড়ে মৃণালের শ্রীক্ষেত্রে জগদীশ্বরের কাছে আশ্রয় নেয়ার খবর জানা ছোটগল্পের শিল্পের স্বার্থে জরুরি নয়। বরং মৃণালের গন্তব্যের খবর জানা না থাকলেই মৃণাল চরিত্রের দুঃখ এবং গল্পের গভীরতা, দ্ব্যর্থতা তৈরি হতো।

শ্রীক্ষেত্রে মৃণালের গন্তব্য নির্ধারণ হয়তো করেছে কল্যাণকামী, ভাববাদী, সচেতন রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নন।